শ্রমিকের লেখা

"রানা প্লাজা এক ক্ষতি করছে আমার, আরেক ক্ষতি করছে এই ক্ষতিপূরণওয়ালারা"

শরিফা খাতুন

জ্যান্ত কবর দিলে কেমন লাগে, সেইটা আমি জানি। মাথার উপর বিল্ডিং ভাইঙ্গা পড়ল। জ্ঞান ফিরে দেখি সব আন্ধার। ঘরে ইন্দুর ঢুকলে যেমন খছর-মছর হয়, তেমন শব্দ। চোখে বালু কিচকিচ। ভাবছি এই সব কবরের আজাব। একটা দেয়াল আমার গায়ে চেপে বসে আছে। শরীরের নিচের অংশ অবশ। কিন্তু মাথাটা একটু নাড়তে পারি। আয়াতুল কুরছি পড়তে শুরু করলাম। শরীর বালুতে কুটকুট করছে। মনে হলো, সারা শরীরে পোকা-মাকড় হাঁটে। মনে মনে, আরো জোরে জোরে আয়াতুল কুরছি পড়তে শুরু করলাম। আমার তখনও মনে হয় নাই আমি বেঁচে আছি। কতক্ষণ পরে হবে জানি না, হঠাৎ কাছেই একটা মোবাইল বাজতে বাজতে থেমে গেল। মোবাইলের আওয়াজে একজন বলতে শুরু করল, পুরুষ কণ্ঠ–মা, ও মা, আমি আছি।

তখন আমি ভাবলাম, আমি কি আসলে মইরা গেছি। মইরা গেলে তো সব শেষ। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম। নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজে একবার মনে হলো, বেঁচে আছি মনে হয়। তা-ও বিশ্বাস যাই না। আস্তে আস্তে করে ডাকলাম–ও ভাই, ও ভাই, আছেন? তখন আমার সাথে দূরে যে ছিল, জবাব দিল। আমি জিজ্ঞেস করি, বেলাল ভাই? আসলে বেলাল ভাই ছিল না। অন্য ফ্লোরের। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার কী অবস্থা, নড়তে পারব কি না। তার পায়ের উপর পিলার পড়ছে, রক্ত বের হচ্ছে। কিন্তু সে নড়াচড়া করতে পারে। আবার ফোন বাজতে শুরু করল। আমরা দুইজনেই ফোনের উত্তর দিলাম–হ্যালো। ফোন কিন্তু আমাদের হাতে না। রিংটোনটা আমার না। বুঝলাম অন্য কারো ফোন। আমি ফ্যান্টম, সে নিউ ওয়েভ।

অন্ধকারে দিনরাত বোঝা যায় না। ভাবলাম–বাবু স্কুল থেকে বাসায় এসেছে মনে হয়। আমি টের পাইলাম আমি প্রস্রাব করতেছি। আবারও মনে হলো, কবরের আজাব। না হলে এমন হবে কেন? একমাত্র দোজখেই মানুষ হাগে-মুতে একই জায়গায়। জীবনে এমন তো কোনো অপরাধ করি নাই যে এমন আজাব আল্লা আমারে দিল! পাশে নিউ ওয়েভের ভাই জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল, পুরুষ মাইনসের সেকি ডাক! সে নিশ্চিত ছিল যে আমরা বেঁচে আছি। আমাকে বারবার বলল–ও বোইন, আমার ছোট ভাইটারে কে দেখব অখন? আমার বাঁ হাত না ডান হাত বলতে পারব না, একটা হাত আলগা ছিল। আশপাশ হাতড়ায়ে দেখি কিছু পাই কি না। বালু আর বালু। বোইন, পাইলা কিছু? আমার শুধু পা আটকা। এক হ্যাঁচকা টান মারলে বের করতে পারবা। সে চিৎকার করছিল। কাঁদছিল। আমি একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম–আল্লারে ডাকেন।

গরিব মানুষ মরলে কে বাঁচাইতে আইব। আমি বাঁচতে চাই নাই। আমি খালি আল্লারে কইছি, তুমি কষ্ট দিয়ো না, উঠায়ে নাও, দেরি কইরো না। পানির তেষ্টা, সারা শরীর অবশ। নিঃশ্বাস নিতে পারি নাই। জ্যান্ত কবর দিলে মরতে কতক্ষণ লাগে? আবার বোধ হয় জ্ঞান হারাইছি। উঠে দেখি নিউ ওয়েভের ভাইয়ের কোনো আওয়াজ নাই। কয়েকবার ডাকলাম। গলা দিয়ে আওয়াজ তখন বাইর হইছে কি না তা-ও জানি না।

পরে শুনছি, আমারে দেড় দিন পরে বের করছে। আমি কদ্দিন হাসপাতালে ছিলাম, কয়টা অপারেশন হইছে, এর পরের কয়েক মাস আমি ঠাহর পাই নাই। সিআরপিতে শুনছি মেরুদণ্ডে ডিস্ক বসাইছে। বহু লোক খোঁজখবর নিছে। সাংবাদিক, টিভি–কত্ত বিদেশি লোকজন! আমার মেয়েটা ৭-৮ মাস স্কুলে যায় নাই। আমার দেখশুন করছে। বাড়ি থেকেই লোকজন আসছে। অবাক হইছি। আমি তো পালায়ে বিয়া কইরা শ্রীপুর আসছি। বাপ-মা মত দেয় নাই। এক ঈদের পরে চলে আসছি। আইসা দেখি তার আগের সংসার আছে। কী করব? কিছুদিন সতিনের সাথে থাকছি। তারপরে নিজেও গার্মেন্টসে ঢুকছি। পেটে বাচ্চা আসছে পরে দেশে ফেরত গেলাম। বড় ভাই ঘরে ঢুকতে দেয় নাই। একদানা পানি মুখে না দিয়ে এক কাপড়ে আবার বাসে উঠছি। তারপর ক্যামনে ক্যামনে সাভার আসলাম। আমার বড় বোনের জামাইও গার্মেন্টসে কাজ করে, সে আমাদের সবাইরে ভর্তি করল। তো অবাক হলাম বড় ভাইরে দেইখা। পড়ে বুঝছি, টাকা-পয়সার লোভে মৌমাছির মতন লোক ভিড়ছে।

ঘটনার পর দুই বছর লাগছে পুরা। আমি ঠিকমতন খাড়া হয়ে দাঁড়াইছি। সিআরপি থেকে রিহ্যাবিলিটেশন করল। আমারে ৭০ হাজার টাকা আর মুদির দোকানের ট্রেনিং দিল। আমাদের এই গলিতেই আমরা চারজন রানা প্লাজার আহত শ্রমিক মুদির দোকান করি। আরো কত রকম রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য লোক আসে। কেউ বলে টাইপিং শিখায়ে চাকরি দেবে। কেউ বলে বিদেশে নিয়ে যাবে। এদিকে গুলশান থেকে ক্ষতিপূরণের চিঠি আসছে। আমার তো মেডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট ভালো আসে নাই। যাদের ভালো আসছে, তারা ম্যালা টাকার চিঠি পাইছে। আমার রিপোর্টে লিখছে শুধু কোমরে ডিস্কের কথা, আমি বর্তমানে কাজে সক্ষম। আমার পরিবারে পড়তে জানে লোক নাই। না বুইঝ্যা ভাই-বোনে ঝগড়া-কাইজ্যা চলতেই লাগল। দুই বোন থাকতাম কোনো রকম। কার বাড়া ভাতে ছাই পড়ছে কে জানে। বোন সারা দিন সন্দেহ করে। ভাবে আমি অনেক ট্যাকা পাইছি, কিন্তু কাউরে জানাই না। আমার চিঠি আসছে মাত্র দেড় লাখ টাকার।

আমি এখন বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পারি না। ভারী জিনিস টানতে পারি না। রান্না করলে ভাতের মাড় গালে আমার মেয়ে। রানা প্লাজা এক ক্ষতি করছে আমার, আরেক ক্ষতি করছে এই ক্ষতিপূরণওয়ালারা। সারা দিন গুজব। চারদিকে গুজব। মোবাইলে টাকা আসছে তো, ব্যাংকে টাকা আসছে। টাকার পিছনে ছুটছে সব। আজকে প্রেস ক্লাব, কালকে রানা প্লাজা। কত আপা যে আসলো! এসবের মধ্যে এক লোক রোজ দোকানে বসে থাকে, আমারে নাকি তার পছন্দ। মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমি রা করি না। আমি তারে পষ্টই বলছি, আমাকে বেশি টাকা দেয় নাই। সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। ছয় মাস ঘুরাঘুরির পর, জানি না ক্যামনে, আমি এই ভুল করলাম। আমি তারে বিশ্বাস করলাম। বিয়া করলাম। তারপরে আরেক দোজখ।

সে বিশ্বাস করে না, ভাবে আমি টাকা ব্যাংকে লুকায়ে রাখছি। রোজ ঝগড়া। টাকা কি ব্যাংকে লুকায়ে রাখার জিনিস। ব্যাংকে তো গুলশান থেকে টাকা ভরছে, যেমন প্রাইমাক মোবাইলে ভরছে। দোকান দিবে, জমি দিবে–সব আমার নামে, কিন্তু তারে টাকা-পয়সা সব আমার বুঝায়ে দিতে হবে। দিনভর চলে এই নিয়ে হানাহানি। রাতের বেলায় আরেক ঝামিলা। আমার তো পিঠে ব্যথা। কোনো ভার নিতে পারি না। আমি সকালে বিছানা থেকে নামতে পারি না। আবার পুরা বিছানায় পড়ে গেলাম। মাথার উপর ছাদের মতন বোন-দুলাভাই ছিল। ওরা নাই। ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে বিবাদে তারাও চলে গেছে। শেষে সিআরপির এক আপা এসে আমাকে নিয়ে গেল। আবার ভর্তি হলাম। মেয়ে নিয়ে পড়ে থাকলাম সিআরপিতে। ঘটনার আড়াই কি তিন বছর পর। এদিকে দোকান বন্ধ পড়ে আছে। চলবে কী করে। মেয়ের স্কুল বন্ধ। বোনটা মাঝে মাঝে আসে, দুলাভাই আর মুখও দেখতে আসে নাই। এর মধ্যে রানা প্লাজার জাহিদার মরার খবর পাইলাম। এই ক্ষতিপূরণের তিনটা টাকার নামে ভাই-বোন সব হারাইলাম।

তালাক নিতে পারছি। এখন আমি মেয়ে নিয়া এক ঘরে থাকি। কোনোমতে দোকান করি। এক জায়গায় টাইপিং শিখি। আমি পড়ালেখা জানি। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে পালায়ে বিয়ে বসছিলাম। এক সাংবাদিক ভাই বলছে, টাইপিং শিখলে ঢাকায় একটা এনজিওতে চাকরি দেবে। তারাই টাইপিং স্কুলের টাকা দেয়। কত রকম আশ্বাস দিছে মানুষ! শেষমেশ কী হয়? দিবে কি না জানি না। ▣

শরিফা খাতুন : রানা প্লাজার ফ্যান্টম অ্যাপারেলসের অপারেটর ছিলেন।